Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 517 - 526
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive
OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 517 - 526
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্র-চিন্তায় দুঃখ ও মুক্তি : চিঠিপত্র সাত

রিঙ্কি বৈরাগী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: rinkibairagi58@gmail.com

Received Date 15. 06. 2026
Selection Date 15. 07. 2026

Keyword
Sukh, Dukkha, Mukti, Satya, God, Atma, Shanti, Paramatma.

Abstract
Rabindra Patra sahitya are the best medium for self–discovery. His letters cover a various subjects like society, state, religion, philosophy, education, literature, love, etc. along with the awareness of joy and sorrow, he also offers ways to overcome them. I have tried to show this based on the letters written to Kadambini Devi in volume-7 of some letters. The purpose of human life is to establish the nature of truth in life. To achieve that goal hard work is required. That pursuit (sadhana) is successful in extreme pain and suffering. And on the path of sorrow, you have to sacrifice your life for that sadhana by giving your own blood. The poet reached this level of Self-realization through countless deaths and bloodshed and become aware of the true nature of worldly life. Therefore, the poet never lost faith in God under any circumstances. Between union-separation, happiness-sorrow, Achievement and failure. Because sorrow is the true capital in ours lives. The union that binds us together, in separation it transcends into a universal consciousness. In the life of the hero of his 'EKRATRI' short story, an eternal night emerged form a sad night of unrequited love. Deep sorrow illuminatets the light of true humanity life – within which eternal happiness is born. In his puja parjay songs says - ''Dukhher Timire Jole Tobo Mangol Alok Tobe Tai Hok.'' Rabindranath tagore, in shilaidaha, sajadpur, patisar coming into contact with nature and people. And by absorbing the infinite theory of the universe, reaching a philosophical level. And gives us the gift of the priceless gems of human consciousness to transcend into a greater life. Indian philosophy talks about eternal liberation from suffering or spiritual liberation but the poet has objections to this eternal liberation. Rabindra's philosophy shows the path to greatness in life, not by avoiding suffering but by accepting it truthfully and wishing.

Discussion

'দুঃখ' - এই শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হতে বহু শতসহস্র বছর পূর্বে রাজভবন থেকে পথে নেমেছিলেন শাক্য বংশের রাজপুত্র সিদ্ধার্থ। কিছু সময় পরে দুঃখ সম্বন্ধে বোধ বা জ্ঞান জন্মালে তিনি বোধিসত্ত্ব লাভ করেন এবং হয়ে ওঠেন ভগবান বুদ্ধ।

তাঁর জীবনের এই তপস্যা সাধারণ মানুষকে এনে দিয়েছিল নির্বাণ বা মুক্তি-দুঃখ থেকে চিরতরে মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের জীবন তপস্যার বিভূতিও সাধারণ মানুষের জন্য নির্বাণ ও মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। যদিও রবীন্দ্রনাথ দুঃখ থেকে চিরতার মুক্তিতে বিশ্বাসী নন। আগুনে পুড়ে লোহার যেমন নবনির্মাণ হয়, তেমনি আগুনে পুড়ে মানুষ মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হয়। জল জমে যেমন ক্রিষ্টিলাইজড হয়ে ওঠে অর্থাৎ স্বচ্ছ বরফে পরিণত হয় তেমনি দুঃখের আতসবাজির আলোতে অন্ধকারে থাকা মানুষের অন্তরমন আলোকিত হয়ে ওঠে। ওই স্বচ্ছ বরফের মতো ট্রান্সফারেন্ট হয়ে ওঠে অন্তর ও বাহির। কোথাও অন্ধকার নেই, শুধু আলো আর আনন্দ। উপনিষদ্ বলে – ‘আনন্দই ব্রহ্ম’।

> “আনন্দো ব্রহ্মোতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।”[১]

এই আনন্দ থেকেই সমগ্র ভূতবর্গ জাত হয়েছে, জাত হয়ে এই আনন্দের দ্বারাই সমস্ত কিছুর বর্ধন ও পরিপোষণ হয় এবং পরিশেষে আনন্দাভিমুখে সমস্ত বিলীন হয়। ভৃগু তপস্যার দ্বারা এই আনন্দব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন।

জগতের সমস্ত কিছু যদি এই আনন্দের সৃষ্টি, আনন্দেই পোষণ হয়ে আবার আনন্দেই বিলীন হয়, তবে এর মাঝে দুঃখ কোথা থেকে এলো? এর উত্তর হল - গর্ভাশয়ের অন্ধকারের পাত্র থেকে যেমন নবশিশুর জন্ম হয়, তেমনি দুঃখের অন্ধকারের কোঁক থেকে জন্ম নেয় গভীর আনন্দ। দুঃখও আনন্দরূপমমৃতম্। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘ধর্মগ্রন্থে’র ‘দুঃখ’ প্রবন্ধে বলেছেন -

> “জগতের এই অপূর্ণতা যেমন পূর্ণতার বিপরীত নহে, কিন্তু তাহা যেমন পূর্ণতারই একটি প্রকাশ তেমনি এই অপূর্ণতার নিত্য সহচর দুঃখও আনন্দের বিপরীত নহে, তাহা আনন্দেরই অঙ্গ। অর্থাৎ দুঃখের পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা দুঃখই নহে, তাহা আনন্দ। দুঃখও আনন্দরূপমমৃতম্।”[২]

এই দুঃখই আমাদের চিত্তকে চেতনায় এবং আত্মাকে সত্যে সম্পূর্ণ করে চলেছে প্রতি মুহূর্তে। অর্থাৎ দুঃখ সাফাইকর্মীর কাজ করে চলেছে। চিত্তের মলিনতাকে দূর করে প্রতিনিয়ত স্বচ্ছতায় ও চেতনার বিস্ময়ে জাগিয়ে তুলছে।

রবীন্দ্র চিঠিপত্র-এর সাত নং খণ্ডে আমরা কাদম্বিনী দত্তের পরিচয় পাই, যিনি বিবাহের কিছুকাল পরেই বিধবা হন। এই শোকের সময় কাদম্বিনী সান্ত্বনা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়ে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁর পত্রের উত্তর দেন।

> “আমার কোন কোন রচনা তোমাকে শান্তি ও সান্ত্বনা দিয়াছে শুনিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি। নরনারীর চিত্তে ভগবানের অমৃতধারা প্রবাহিত করাইয়া দেওয়া - কোন লেখকের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কিছুই হইতে পারে না। ... এই কথা সর্বদাই মনে রাখিয়ো, ভগবান আমাদের সেবার অপেক্ষা রাখেন না ... তিনি স্বামিরূপে প্রীতি, পুত্ররূপে আমাদের স্নেহ, দানরূপে আমাদের দয়া গ্রহণ করেন। ... শোক দুঃখকে তাঁহার হস্তের দান বলিয়া নতশিরে গ্রহণ করিলে জীবনের সমস্ত বেদনাও সার্থক হইয়া উঠিবে। সংসারকেই ঈশ্বরের পাদপীঠ জানিয়া সেই সংসার-মন্দিরেই তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিবে এবং প্রসন্নচিত্তে প্রফুল্লমুখে প্রতিদিন সংসারের কল্যাণ সাধন দ্বারা ভগবানের প্রত্যক্ষ সেবা করিয়া জীবনকে কৃতার্থ করিবে।”[৩]

চিঠিটি পড়লে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ এখানে অনেক বেশি ঈশ্বর বিশ্বাসী এবং জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যে তিনি ঈশ্বরের করুনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই কাদম্বিনী দেবীকে তিনি বলেছেন সংসার ক্লিষ্ট হৃদয়ে শান্তির জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। সুখ-দুঃখ মানুষের জীবন প্রবাহে আদি ও অনন্তকাল ধরে চলেছে।

> “নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।”[৪]

কাদম্বিনী দেবীর ধীশক্তি ও ঈশ্বরজিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি বাল্যবিধবা। কবি তাঁর অন্তরে ঈশ্বরের অমৃতধারা প্রবাহিত ক’রে শান্তি আনয়নে সক্ষম হয়েছিলেন। কবি পরম হিতৈষীরূপে পরামর্শ দেন যে - আমাদের জীবনে প্রত্যেকটি দুঃখময় ঘটনা ঈশ্বরের বিধানে ঘটে। তাই প্রত্যহ এমন একটি কর্ম করতে হবে যা কেবলমাত্র তাঁরই উদ্দেশে করা হবে। যার কোনো যশ বা প্রতিদান পাবে না। তিনি আরো বলেছেন -

> "দিনের মধ্যে অন্তত একটা কাজ যদি ইচ্ছাপূর্বক, বাধ্য না হইয়া, সমস্ত ফল-কামনা নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করিতে পারো তবে সেই কর্মের মধ্যে তোমার পূজা সমাধা হইবে তোমার জীবনও কৃতার্থ হইবে।"[৫]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের কর্মযোগের কথা মনে পড়ে যায়। সেখানে সমস্ত কর্মের ফলাফল ঈশ্বরে সমর্পিত করে শুধুমাত্র ঈশ্বরের প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্ম করার কথা বলা হয়েছে। যাকে বলা হয়েছে নিষ্কাম কর্ম। অর্থাৎ কামনা শূন্য হয়ে কর্ম করলে মানুষ মুক্তির পথ পেতে পারে।

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ।"[৬]

গীতার প্রথম অধ্যায়ের অর্জুন বিষাদযোগ-এ অর্জুন ভবিষ্যৎ প্রিয় বিচ্ছেদের আশঙ্কায় শোকগ্রস্ত হয়ে, মোহাচ্ছন্ন হয়ে যুদ্ধ করার সংকল্প পরিত্যাগ করেছিলেন। আর দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ এ অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করলে, শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বরের উদ্দেশ্যে নিঃস্বার্থ সেবার প্রকৃতি এবং আত্মজ্ঞানলাভের উপায় বলেন। এবং সবশেষে অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলেছেন,

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"[৭]

অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম কর্তব্য কর্মের আশ্রয় আমাতে পরিত্যাগ করে তুমি আমারই শরণ নাও। আমি তোমাকে সর্বপাপ থেকে মুক্ত করব। কোনোপ্রকার শোক করো না।

আসলে আমরা এক একজন অর্জুন। আমরা আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনার মোহ থেকে মুক্তি পেতে একজন গুরুকে খুঁজে চলেছি নিরন্তর এবং হৃদয়রূপ কুরুক্ষেত্রে হয়ে চলেছে ভালো-মন্দের, সুখ-দুঃখের নিরন্তন যুদ্ধ। কাদম্বিনী দত্ত সেই গুরুভাবে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এবং রবীন্দ্রনাথও তাঁকে শিষ্যা রূপে আশ্রয় ও আশ্বাস দিয়েছিলেন।

ঈশ্বর আমাদের জীবনে মঙ্গলময় সংগীত রচনা করে চলেছেন সুখ-দুঃখরূপ ঘটনার মধ্য দিয়ে। এখন যদি আমরা শোক করে তাঁর মঙ্গলময় কাজে বাধা হয়ে দাঁড়াই তাহলে তিনি মঙ্গল করবেন কী করে? রবীন্দ্র-চিন্তায় বেদনারও পরম মূল্য আছে। বেদনার মূল্যে জীবনের সত্য সফলতা পায়। এ প্রসঙ্গে তিনি কাদম্বিনী দত্তকে লিখেছেন -

> "ঈশ্বর তাঁর পরম দানগুলিকে দুঃখের ভিতর দিয়াই সম্পূর্ণ করেন-তিনি বেদনার মধ্য দিয়া জননীকে সন্তান দেন - সেই বেদনার মূল্যেই সন্তান জননীর এত অত্যন্তই আপন। সেই কথা মনে রাখিয়া, যখন ঈশ্বরের কাছে সত্য চাই, আলোক চাই, অমৃত চাই তখন অনেক বেদনা অনেক ত্যাগের জন্য নিজেকে সবলে প্রস্তুত করিতে হইবে। মা, ঈশ্বর যদি তোমাকে বেদনা দেন তবে নিজের দোষে সেই বেদনাকে ব্যর্থ করিয়ো না - তাহাকে সফল করিবার জন্য সমস্ত হৃদয় মনকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া জাগ্রত হও।"[৮]

অর্থাৎ ঈশ্বর আমাদের যে শোক দিয়ে থাকেন তা তাঁর অনুগ্রহের দান। আমরা সচেতন চিত্তে তা গ্রহণ করলে সেই শোক সার্থক হয়ে ওঠে জীবনে। আর উদাসীনভাবে শোককে বর্জন করলে তাঁর অনুগ্রহ নিষ্ফল হয়ে যায়। কবি পত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু হয় ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০৯ সাল, ইংরাজি ২৯ নভেম্বর ১৯০২। ১৮ অগ্রহায়ণ কবি দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখেছিলেন-

> "ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন তাহা যদি নিরর্থক হয় তবে এমন বিড়ম্বনা আর কী হইতে পারে! ইহা আমি মাথা নিচু করিয়া গ্রহন করিলাম। যিনি আপন জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্টকালকে সার্থক করিবেন। তাঁহার কল্যাণী স্মৃতি আমার সমস্ত কল্যাণ কর্ম্মের নিত্যসহায় হইয়া আমাকে বলদান করিবে।"[৯]

কবির মতে বেদনাটা আমাদের জীবনের বাস্তব জিনিস নয়। বেদনাটাকে জীবনে বাস্তব মনে করাটা আমাদের স্বভাবের দুর্বলতা।

P. B. Shelley তাঁর 'To a Skylark' কবিতায় বলেছেন – "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought," - অর্থাৎ গভীর দুঃখের গান অসীমের আনন্দ দেয়। দুঃখ নিত্য সত্য - এ কথাটিতে দুঃখ যে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 517 - 526
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

একান্ত দুঃখ হিসাবেই নিত্য সত্য তা নয় - তাতে আনন্দ জমাট অতি-তীক্ষ্ণ-ভাবে আছে, তা বিদীর্ণ করে আনন্দই বিকীর্ণ হয়ে পড়ছে। এই অর্থে দুঃখের পরিবর্তিত রূপই আনন্দ। অর্থাৎ গভীর বেদনা বা শোক প্রক্রিয়াজাত হয়ে (processing) হয়ে আনন্দে রূপান্তরিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মৃত্যুও পারমার্থিক সত্য, এখানে মৃত্যু মৃত্যু নয়, তা জীবনের ভিত্তি, নবজন্মের উৎসভূমি। মিলন ও বিরহের সম্বন্ধও তাই। মিলনের তীব্রতাই বিরহ এনে দেয়। বিরহ যে ছেদ টানতে টানতে চলে মিলন তারই মধ্যে গাঢ় হয়ে ওঠে, সত্য হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে পারুল দেবী (কলকাতা হাই কোর্টের আইনজীবী শরৎচন্দ্র লাহিড়ীর কন্যা পারুল দেবী, যাঁর জন্ম ১৯১৫ সালে), রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে নাতনী, কবিকে প্রশ্ন করেন, সুখের চেয়ে দুঃখ, মিলনের চেয়ে বিরহ ভালো কিনা। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উত্তর -

> "এসব কথার জবাব একটা নয়-কোনো ক্ষেত্রে ভালো, কোনো ক্ষেত্রে ভালো নয়, অবস্থা বুঝে তার বিচার। অনেক সময় আমরা সুখের সত্যকার যাচাই করতে পারিনে, তখন যেটা চেয়ে বসি সেটা না পাওয়াই বাঁচোয়া, যেটা হাতে পাই সেটা হারালেই রক্ষে। অনেক সময়ে মিলনে আমরা মানুষকে সম্পূর্ণ জানতে পারিনে, জানি তাঁর খুঁটিনাটিগুলো - বিরহে সেই সমস্ত অবান্তর জিনিসগুলো বাদ দিয়ে আসল সত্যটিকে সহজে উপলব্ধি করতে পারি। পরিপূর্ণ করে পেয়েছি বলে যখন মনে করি তখন ঠকি। ... সেই জন্য আনন্দের মধ্যে চির-অতৃপ্তি থাকে।" মজার কথা হল – "পাবার মত জিনিসকে নিঃশেষ করে পাওয়া যায় না, তার অনেকখানিই রয়ে যায় না পাওয়ার মধ্যে। বিরহে সেই পাওয়া এবং না পাওয়াকে মিলিয়ে দেখতে পারি, মিলনে সবটা চোখে পড়ে না।"[১০]

বাস্তবিকভাবে পাওয়ার মধ্যে সত্যকারের পাওয়া নেই। কোন কিছুকে সাক্ষাৎভাবে পাওয়ার অর্থ হল তাকে ফুরিয়ে দেওয়া। তাই অনিশ্চত সত্তাকে প্রতিনিয়ত পাওয়ার সাধনায় এগিয়ে চলাই ধর্ম। এ অর্থে সিদ্ধি অপেক্ষা সাধনা বড় জিনিস, কারণ সিদ্ধির অর্থ স্থিতি, কিন্তু সাধনা মানে এগিয়ে চলা, এক সিদ্ধি থেকে আর এক সিদ্ধিতে অগ্রসর হওয়া। আর সাধনার মূলধন হচ্ছে দুঃখ, মৃত্য, বিরহ, শোক।

'চরৈবেতি' - উপনিষদের এই মূলমন্ত্র শেখায় এগিয়ে চলাই জীবনের প্রকৃত ধর্ম। যার মূল দর্শন অলসতা ত্যাগ করে প্রতিকূলতার মাঝেও গতিশীলতা বজায় রেখে নিরন্তর এগিয়ে চলা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থে জগতের সমস্ত সত্তাকে আমাদের সত্তার দ্বারা অনুভব করার কথা বলেছেন। ভূমার মাঝে নিজেকে উপলব্ধি, জীবচৈতন্যের বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে জন্ম নিয়ে দ্বিজ হয়ে ওঠার কথা বলেছেন। এই জন্ম লাভই আধ্যাত্মিক জন্ম। প্রশ্ন হতে পারে আধ্যাত্মিক জন্ম আমাদের কী দেয়? উত্তর হল - আধ্যাত্মিকতা আমাদের আর কিছু না দিক, আমাদের ঔদাসীন্য, অলসতা ঘুচিয়ে দেয়। আর তখনই আমরা ছেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। এই পাওয়া যখন আসে তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে - সমস্ত তাঁরই আনন্দরূপ। কাদম্বিনী দেবী রবীন্দ্রনাথের এই 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থ পড়েছিলেন এবং উপকৃতও হয়েছিলেন। তাঁর সংসারক্লিষ্ট হৃদয়ে এই গ্রন্থ যে শান্তি আনয়ন করেছিল তা বোঝা যায় ১২ নং চিঠিটি পড়ে, -

> "শান্তিনিকেতন পড়িয়া তুমি কিছু উপকার বোধ করিতেছ ইহাতে আমি আনন্দিত হইলাম। জীবনে এমন কোনো সিদ্ধিলাভ করি নাই যাহাতে পরম সত্যকে তোমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করিয়া দিতে পারি - তবে যদি ঈশ্বর আমাকে ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা দিয়া থাকেন, এবং সেই উপায়ে তিনি আমাকে দিয়া যদি তাঁহার কোনো কাজ উদ্ধার করিয়া লন তবে আমার এই পৃথিবীতে জন্মলাভ সার্থক হইবে।"[১১]

শুধু তাঁর রচনা পড়ে নয়, ওঁর সঙ্গে পত্রালোচনায় কাদম্বিনী দেবী মনে বল ও সাহস পেয়েছেন এবং জেনেছেন বিশুদ্ধ মঙ্গলের জন্যে সাধনাকে কোনো মতে নীচের দিকে নামতে দিলে চলবে না। হৃদয়কে, মনকে, কল্পনাকে, কর্মকে সর্বদা মুক্তির অভিমুখে আকর্ষণ করতে হবে। তাকে কোনো রকম প্রলোভনের ফাঁদে ভুলিয়ে রাখলে চলবে না। এই মুক্তি জ্ঞানের মধ্যে মুক্তি নয়, প্রেমের মধ্যে মুক্তি। যেখানে কোনোপ্রকার কাল্পনিক জঞ্জাল নেই। প্রেমের এই অন্তরঙ্গ সাধনায় মনকে সর্বদা নিয়োজিত রেখে চিত্তকে প্রস্তুত রাখতে হয়। কারণ সত্যের পথ, সাধনার পথ সহজ নয়, পিছনে টেনে রাখার হাজার বন্ধন আছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 517 - 526
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন যে অনির্বচনীয় সত্য সর্বত্র সমানভাবে রয়েছে – 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' - সুখে দুঃখে, পাপে পুন্যে, জীবনে মৃত্যুতে, মিলনে বিরহে সর্বত্র এবং এই সৌন্দর্যের আভায় অতি কুৎসিতও সুন্দর হয়ে ওঠে - 'যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'। যেখানে গিয়ে মৃত্যু ও অমৃত্যু, দুঃখ ও আনন্দ একাকার হয়ে যায় তাকে রবীন্দ্রনাথ দেবতা বলেছেন। এই উপলব্ধি গভীর হলেই আত্মা দুঃখকে পূজা করে, আরামকে নয়। কারণ এইটুকু বোধ তখন হয় যে - অমাবস্যার অন্ধকার যেমন অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী প্রকাশ করে দেয়, তেমনি দুঃখের নিবিড়তম তমসাও অনন্ত আনন্দলোকের প্রকাশ করে দেয়, সেই তমসার মধ্যে অবতীর্ণ হয়ে আত্মা আনন্দলোকের ধ্রুব দীপ্তি দেখতে পায়। রবীন্দ্রনাথ এই সমব্রহ্ম বা সমভাবের দীক্ষা পেয়েছিলেন মহাভারত, গীতা ও উপনিষদ থেকে। ৩ নং চিঠিতে কাদম্বিনীকে তিনি জানান –

> "ঈশ্বর যার অন্তকরণে সুখী হইবার শক্তি দেন সেই জীবন হইতে জগৎ হইতে সুখ লাভ করিতে পারে।"[১২]

কারণ এমন অনেক মানুষ আছে যারা সুখকর সমস্ত উপকরণ দ্বারা সর্বদা বেষ্টিত থাকে, অথচ তাদের হৃদয়ের শান্তি নেই, সুখ নেই। ঈশোপনিষদ বলছে -

> "ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।"[১৩]

অর্থাৎ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বরের দ্বারা আবৃত আছে, এবং কেনোপনিষদ বলছেন, -

> "ওঁ কেনেষীতং পততি প্রেষিতং মনঃ। কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি। চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি।"[১৪]

অর্থাৎ কার ইচ্ছায় আমাদের মন তার বিষয়ে ধাবিত হয়? কার দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রাণ তার নিজের কাজ করে? লোক বাক্য উচ্চারণ করে কার শক্তির দ্বারা? কোন জ্যোতিষ্মানের ইচ্ছায় চোখ দেখে ও কান শোনে? অর্থাৎ যিনি পরম ঈশ্বর তিনি এই মনেরও মন, প্রাণেরও প্রাণ, চোখেরও চোখ। তিনিই পূর্ণ। তাঁর শক্তিতে, তাঁরই ইচ্ছায় আমাদের হৃদয় শান্তি ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। তাঁরই শক্তির দ্বারা আমরা আবৃত আমরা বিধৃত - এই যে এতবড় প্রেমের দ্বারা আমরা পরিবেষ্টিত হয়ে আছি - এটা জানার পরেও কীসের দৈন্যতা, কীসের দুঃখকে আমরা আমার 'আমি' থেকে বড় করে দেখি? আমাদের প্রতিমুহূর্তের দৃষ্টিশক্তি, প্রতিমুহূর্তের শোনবার ক্ষমতা, প্রতিমুহূর্তের নিঃশ্বাস নেবার ক্ষমতা এ এক আশ্চর্য ঘটনা - এই পরমাশ্চর্য ঘটনা যে ঘটে চলেছে তার জন্য ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ব্যয় হয়ে চলেছে। সেই শক্তি কণামাত্র হ্রাস হলে আমরা তৎক্ষণাৎ বিলীন হয়ে যাব। তাই ৩ নং চিঠিতে কবি বলেছেন -

> "বাহিরের কঠিনতা যতই কঠিন অন্তরের শক্তিকে ততই প্রাণপণ বলে উদ্বোধিত করিতে হইবে। ... সমস্ত দুঃখ দৈন্য অভাবের চেয়ে যে আমি বড় ইহা বারম্বার মনকে বুঝাইয়ো। ... আমার মন এই পরমাশ্চর্য সত্তাকে কোনো দুঃখই মলিন করিতে এবং কোনো পীড়নই ক্ষুদ্র করিতে পারে না।"

তাই "মন যখনই অপ্রসন্ন হইতে চাহিবে তখনি তাহাকে তোমার সমস্ত শক্তিতে ঊর্ধের দিকে টানিয়া তুলিবে, বলিবে -

'সুখং বা যদিবা দুঃখং
প্রিয়ং বা যদিবা প্রিয়ম্
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীতা
হৃদয়েনাপরাজিতা'।"[১৫]

সুখ হোক, দুঃখ হোক, প্রিয় হোক বা অপ্রিয় হোক, যা কিছু আসুক, অপরাজিত চিত্তে তাকে উপাসনা করতে হবে। ২ নং চিঠিতে বলছেন –

> "শোক দুঃখকে তাঁহার হস্তের দান বলিয়া নতশিরে ধারণ করিলে জীবনের সমস্ত বেদনাও সার্থক হইয়া উঠিবে।"[১৬]

১ নং চিঠিতে বলেছেন, -

> "আমাদের জীবনের প্রত্যেক সুখ দুঃখ তাঁহারই বিধানে ঘটিতেছে। যখন একথা নিশ্চয় যে আমার বন্ধুর বিধান ছাড়া জগতে আর কোনো বিধান নাই তখন জীবনের প্রতি মুহূর্তেই আমি ধন্য - সুখ, দুঃখ আমার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 517 - 526
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> সকলই শিরোধার্য - সকল কর্মে সকল স্থানেই তিনি আমাকে আমার সার্থকতার দিকেই লইয়া যাইতেছেন ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"[১৭]

এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, তাঁর পারিপার্শ্বিক আত্মীয়, স্বজন, বন্ধুদের, চেনা, অচেনা সবাইকে দুঃখ থেকে, শোক, মৃত্যু থেকে অতিক্রমণের রাস্তা দেখিয়েছেন। তিনি চিনিয়েছেন দুঃখ শুধু দুঃখের নয় তা আনন্দেরই ঘনীভূত রূপ এবং মৃত্যু তাঁর কাছর 'শ্যাম সমান'। দুঃখকে এভাবে যিনি চিনতে পেরেছেন, মৃত্যু এভাবে যিনি ভালোবাসতে পেরেছে - তাঁর কাছে দুঃখ যত রকমের রূপ নিয়ে আসুক না কেন তা তাঁকে পেয়ে বসে না। তাঁর জীবনের সমস্ত ব্যথা ঊর্ধ্ব পানে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়ে মিলিয়ে যায় –

> "আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে/ এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে/ ... আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব সারা রাত ফোটাক তারা নব/ ...ব্যথা মোর উঠুক জ্বলে ঊর্ধ্ব পানে,/ আগুনের পরশমণি ছোঁয়া ও প্রানে।"[১৮]

রবীন্দ্রনাথ আগুনকে পরশমণি বলছেন। পরশমণি - যাঁর ছোঁয়ায় লোহাও সোনায় পরিণত হয়। সংসারের দুঃখাগুন, শোকের আগুন এগুলোর ছোঁয়া লেগে আমাদের অজ্ঞান, অলস চিত্তের অন্ধকারে আলো জ্বলে ওঠে। সমস্ত অসাড়তা, অজ্ঞতা, অলসতা দূর হয়ে আত্মা জ্ঞানে, চৈতন্যে, সত্যে মগ্ন হয়ে ওঠে। কবি তাঁর জীবনে তো কম মৃত্যু দেখেননি। সর্বদাই তিনি শোক-দুঃখে অবিচলিত থেকে শান্ত, সৌম্য মূর্তি ধরে রেখেছিলেন। এই স্থিরচিত্তের সাধনা তিনি করেছিলেন। দুঃখকে সবসময় তিনি মহত্ত্বের সঙ্গে বহন করেছেন এবং আত্মার শক্তিতে অতিক্রম করবার সাধনা করেছেন। শুধু নিজে করেননি, পারিপার্শ্বিক স্বজনদের দিয়ে করিয়েছেনও। মিরা দেবীকে লেখা পত্রে বলছেন -

> "দুঃখ ভোগ সকলেরই আছে। মনকে সেই দুঃখের উপর নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। আপনার মধ্যে যে মানুষটা দুঃখ পায় তাকে দূরে বাইরে সরিয়ে রাখার অভ্যাস করতে হয়। কেননা সেতো ছায়া আজ আছে কাল নেই - তার সুখ-দুঃখের বোঝা নিয়ে ফেনার মতো কালের স্রোতে ভেসে যায়, কিছুদিনের পরে তার চিহ্নও দেখা যায় না। নিজের গভীর অন্তরের ধ্রুব শান্তির জায়গা আছে সেইখানে আমাদের সত্য আছে যা চিরকালের, যা সংসারের জন্ম মৃত্যু, মিলন-বিচ্ছেদ লাভ ক্ষতি সকলেরই অতীত। সেইখানে আসন নিতে পারলেই মানুষ বাঁচে, সংসারের বাঁচা বাঁচাই নয়।"[১৯]

কবি বলেছেন এই সংসার অনিত্য, নিত্য সত্য নয়, এর সঙ্গে আসক্ত হওয়া একটা মোহ। এই আসক্তি থেকে মনকে প্রতিনিয়ত ছাড়িয়ে নেওয়ার অভ্যাস করতে হবে। প্রতিদিনের ক্ষুদ্রতাকে বৃহত্তের সঙ্গে যোগ রেখে চলতে পারলেই সংসার নামক জাঁতাকলের তলায় পিষতে হয় না। মন সর্বদা এক বৃহৎ সত্যের মধ্যে বিচরণ করতে পারে। এবং সকল দুঃখ অবমাননা থেকে সহজেই মুক্তি পেতে পারে। মীরা দেবীকে এক চিঠিতে কবি বলেছেন -

> "জীবনে এমন সব দুঃখ আসে যাকে এড়াবার কোনো জো নেই, কিন্তু সেই দুঃখের শিখায় আত্মদান করাটা, যজ্ঞের আগুনে আহুতি দেওয়ার মতই পবিত্র করে তোলা মানুষের শক্তিতে আছে। তুই অন্তর্যামীকে বলতে পারিস এই বেদনার মধ্য দিয়ে আমাকে আমি তোমার হাতে দিচ্ছি। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক।"[২০]

'সত্যানুসরণ', গ্রন্থের বানীতে আছে, -

> "তোমার সব অবস্থার ভিতর তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছা বুঝতে চেষ্টা কর, দেখবে কাতর হতে হবে না, বরং হৃদয়ে সবলতা আসবে। দুঃখে ও আনন্দ পাবে।"[২১]
>
> "দুঃখ কারো প্রকৃতিগত নয়কো, তা'কে ইচ্ছে করলেই তাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।"[২২]

আদরের দৌহিত্র নীতিন্দ্রনাথের মৃত্যুতে কবি মীরা দেবীকে সান্ত্বনা দিতে চিঠি লেখেন এবং বলেন ব্যক্তিগত জীবনটাকে অন্য সবকিছুর উপরে প্রত্যক্ষ করে তোলাই সবচেয়ে বড় আত্মবমাননা। কারোর জন্য বিশ্বনিয়মের ব্যাতিক্রম হবে এমন আশা করা মন অত্যন্ত মূঢ় হয়ে পড়ে। কষ্ট যখন সকলকে পেতে হয়, তখন আমিই যে প্রশ্রয় পাবো, এমন দাবি

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 517 - 526
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করার মধ্যে লজ্জা আছে। নীতুর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকাতুর কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে কবি চিঠি লেখেন এবং স্মরণ করেন একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা -

> "শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি - সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারই মধ্যে। ... যা ঘটেছে তাকে যেন সহজে স্বীকার করি, যা কিছু রয়ে গেল তাকেও যেন সম্পূর্ণ সত্য বলে স্বীকার করতে ত্রুটি না ঘটে।"[২৩]

'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের 'সংশয়' প্রবন্ধে কবি বলেছেন - যতক্ষণ না মানুষ 'আমির' সংশয় থেকে নিজেকে বের করতে পারবে ততক্ষণ এই সংসার তার কাছে কেবল সংঘাত, অশান্তি ও দুঃখের কারণ হবে। সমগ্র বিশ্বের সর্বময় কর্তা পরমেশ্বর, এই সত্যে যতক্ষণ না পৌঁছাই ততক্ষণ আমরা নিজেকে জানতেই পারি না। আমাদের জীবনের সংশয় মুক্তির সঙ্গে বন্ধনের টানাটানির কোনো মীমাংসা না হওয়ার কারণে। একদিকে অন্তরাত্মা ছুটে যেতে চায় মুক্তি তথা সত্যের দিকে, অন্যদিকে দেহবোধ বা দেহ চেতনা বিষয়ের সঙ্গে বেঁধে রাখে - এই দুদিকে টানাটানির অবস্থা অসহনীয়। তবে এই অসহনীয় বেদনা চৈতন্যের মুক্তির পূর্বসূচনা। মুক্তির আগে বেদনার অসহনীয় রূপ আসলে ঈশ্বরের অনির্বচনীয় আহ্বান। তাই যথার্থ বেদনা, আত্মাকে সত্যের মধ্যে যথার্থ মুক্তি দেয়।

তাই আত্মাকে নির্মল রাখতে সংসারে ভালো-মন্দ যা-ই আসুক উদার চিত্তে গ্রহণ করতে হবে, তবেই সেই নির্মল আত্মা সত্যে অবগাহন করবে।

> "মনে রে আজ কহ যে, ভালো মন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে।"[২৪]

এই সত্যকে জানা অর্থাৎ নিজেকে জানা। তবে সত্যকে জানার সংগ্রাম সহজ নয়। 'শেষ লেখা' (১৯৪১) কাব্যের 'রূপনারায়ণের কূলে' কবিতায় কবি বলেছেন তিনি নিজেকে জেনেছেন অর্থাৎ নিজের স্বরূপকে চিনেছেন রক্তের অক্ষরে। সত্য কঠিন হলেও তিনি সত্যকে তিনি কখনও ছাড়েননি। কারণ তার মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা নেই, বঞ্চনা নেই।

কাদম্বিনী দেবীকে এই সত্য সম্বন্ধে তিনি অবহিত করেছিলেন। প্রায় প্রত্যেকটি চিঠিতে এই বিষয়ের অবতারণা করেছেন। ঈশ্বর সত্য এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ সত্য। এর বাইরে যা আছে তা ক্ষুদ্র। এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন-

> "হোক না সংসার প্রতিকূল, সমস্ত সংসারের চেয়ে তোমার আত্মা অনেক বেশি বড় - আজ যাহার কাছে হার মানিয়া কান্নাকাটি করিতেছ হঠাৎ দেখিবে তাহা স্বপ্নের মত মিথ্যা। সে ধোঁয়ার মতো তোমাকে হইবেই আচ্ছন্ন করিয়াছে - এই ধোঁয়া বাহির হইতে দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু তোমার মধ্যে যে মৃত্যুহীন শিখাটি রহিয়াছে তাহা চোখে দেখিতে ছোট হইলেও পর্ব্বত প্রমাণ ধোঁয়ার চেয়ে বড়। ... তোমার দুঃখ অবসাদ যতই প্রবল হৌক না কেন তাহার দ্বারা তুমি নিজেকে ছোট করিয়া দেখিয়ো না - অন্তরের মধ্যে নিজের মহত্ত্বকে ধ্রুবরূপে অনুভব কর এবং ঈশ্বরের সঙ্গেই তোমার নিত্য সম্বন্ধকে অন্য সকলের চেয়ে সত্য করিয়া অনুভব করিতে চেষ্টা কর। হাল ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। তুমি জয়ী হইবেই, তীরে উত্তীর্ণ হইবেই, রক্ষা পাইবেই ইহা ধ্রুবনিশ্চয় করিয়া জানিয়ো।"[২৫]

উপনিষদের বিভিন্ন জায়গায় জীবনের দুঃখ-কষ্ট সমস্যার সমাধান আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ সনৎকুমারের কাছে গিয়ে শোক নিবৃত্তির উপায় জানতে চান। একই ভাবে বৃহদারণ্যকোপনিষৎ-এ পতি যাজ্ঞবল্ক্যের আসন্ন সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশের কথা শুনে দুঃখিতা পত্নী মৈত্রেয়ীও তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন করেন এবং অমৃতত্ব লাভের উপায় জানেন। নারদ এবং মৈত্রেয়ী দেবী উভয়েই এই জ্ঞান লাভ করেন যে - 'আত্মাই ব্রহ্ম'। আত্মাই পরমাত্মার স্বরূপ। তিনি একমাত্র পরমার্থ সত্য এবং সত্যের জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র উপায়।

রবীন্দ্র দর্শনে দুঃখ আসলে কোনো সমস্যাই নয়, বরং বেশি করে সমাধান। বেশি করে আরো না পাওয়াকে পাওয়া। কীভাবে দুঃখ আরো না পাওয়াকে পাওয়া? যেখানে দুঃখ আত্মানুসন্ধানের অন্যতম সোপান, সেখানে দুঃখকে মন্থন করে দুঃখরূপ সমুদ্র থেকে আত্মানুসন্ধানের অমৃতপ্রাপ্তি হয়। সেখানে দুঃখ সমাধান ছাড়া আর কি? নিজের মধ্যে আনন্দামৃতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার অভিনব মূল্য তো দুঃখের মধ্যে দিয়েই দিতে হয়। এমন অবস্থায় মানুষ বেশি করে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 517 - 526
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়। আর সে কারণে ঠিক তখনই ঈশ্বরকে সবচেয়ে কাছের বলে অনুভব হয়। আবার সাধারণ ভাবে এই দুঃখই সব মানুষের জীবনে সমস্যার আর এক নাম। কিন্তু এই দুঃখকেই আবার মন্থন করেই আনন্দামৃতের, অমরত্ব প্রাপ্তি হয়। সমস্ত দুঃখ নামক সমস্যার সমাধানই হচ্ছে, তার মধ্যে দিয়ে অন্তরের গভীরতাকে উপলব্ধি করা। সেখানেই শান্তি, সেখানেই মুক্তি।

দুঃখ রবীন্দ্রদর্শনে যথার্থ মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হওয়ার ছাড়পত্র। মনুষ্যালোকে জন্ম নিয়ে মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হওয়া মানুষের জীবনের চরমতম লক্ষ্য। আর সেই লক্ষ্যপথের পাথেয় সঞ্চয় করতে হয় দুঃখ থেকেই। তাই পূর্ণ মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হওয়ার পালা সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত এখান থেকে ছুটি নেই। বস্তুত সমগ্র জীবনের তপস্যাই হল এই মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হওয়া। আর তপস্যা করলে তাপ তো সহ্য করতে হবে। তাই কবি তাঁর কাছে শান্তির সম্বল চাইতে আসা কাদম্বিনী দেবীকে বলেছেন -

> "মা, এই জগৎসংসারে সুন্দর, মঙ্গল এবং সত্য সে কতদিকে কত পূর্ণ হইয়া আছে একবার সমস্ত মন দিয়া তাহা গ্রহণ কর, তাহা হইলে নিজের মধ্যে যাহা ক্ষুদ্র যাহা কুশ্রী তাহা মিলাইয়া যাইবে। ... যে পুরাতন মলিন, যাহা নির্জীব, যাহা জীবনের উপর ভারের মত, তাহাকে প্রাণপণে এই জগদ্ব্যাপী আনন্দসাগরে সৌন্দর্যতরঙ্গে বিসর্জন দাও- নিজের ভিতরকার মৃত্যুহীন পবিত্র অমৃত রূপটি দেখ - দেখ একবার জীবন কি মহৎ, জগৎ কী আশ্চর্য, যিনি চিরদিনের সঙ্গী তিনি কি অন্তরতম - দুঃখগ্লানির ছায়ার খেলা কি তুচ্ছ, মানুষের আত্মার শক্তি মানুষের সংসারের অভিঘাতের চেয়ে কত বড়!"[২৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে যে সত্যে অবগাহন করেছিলেন - সেখান থেকে ঈশ্বরকে তিনি চিনেছিলেন, বুঝেছিলেন, অনুভব করেছিলেন - তার ফলে যে চাওয়া তাঁর মধ্যে তৈরি হয়েছিল, তা তাঁকে পেতে চাওয়া নয় - তাঁর সঙ্গে মিলতে চাওয়া। এই চাওয়াটাই মুখ্য চাওয়া, বাকি সব গৌণ চাওয়া, যা আমাদের বুদ্ধিকে খণ্ডিত করে, আত্মাকে বঞ্চিত করে আর আবরণ করে ফেলে। তাই রবীন্দ্র দর্শনে এই চাওয়াটারও একটা গুরুত্ব আছে।

কাদম্বিনী দত্তের (১২৮৫ - ১৩৫০) পিতা ছিলেন মহিমচন্দ্র সরকার। তাঁর বিবাহ হয়েছিল পূর্ববঙ্গের কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত রুপিয়াট গ্রামের প্রাণগোপাল দত্তের সঙ্গে। বিবাহের কিছুকাল পর প্রাণগোপালবাবুর মৃত্যু হয়। এই সময় কাদম্বিনী দেবীর হৃদয় শোকে ভারাক্রান্ত। এই সময় তিনি আশ্রয় করেন রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালোচনায়। এক চিঠিতে কবি তাঁকে লিখেছেন, -

> "আমার কাছে তুমি শান্তির সম্বল চাহিতে আসিয়াছিলে কিন্তু আমাকে তুমি অনেক সান্ত্বনা দিয়া গিয়াছ।"[২৭]

এই চিঠি কবি লিখছেন – ১লা জানুয়ারি ১৯১৫ সালে। এই চিঠিতেই কবি জানান যে নানান কারণে তাঁকে চারদিক থেকে অনেক অবমাননা পেতে হয়েছে। কাদম্বিনী দেবীর চিঠিতে কবির প্রতি সরল শ্রদ্ধার ভাব তাঁকে প্রবল সন্তাপের মধ্যেও হৃদয়-জুড়ানো স্নিগ্ধতা দিয়েছে। কবি কাদম্বিনী দেবীর সঙ্গে পত্রালাপে জানতে পারেন যে তিনি মুক্তিকে ভয় করেন এবং বন্ধনকে আশ্রয় মনে করেন। আর এই জন্যেই একটা আবরণ থেকে আর একটা আবরণে যেতে তাঁর মনে আকাঙ্ক্ষা জন্মায়। সেই জন্য কবি তাঁকে বলেন, -

> "নির্ম্মুক্ত মনে সত্যকে তার নির্ম্মল স্বরূপে গ্রহণ করবার সাধনাতেই মানুষ যথার্থ শক্তি পায়। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে সেই শক্তি সত্য যে সত্য নিজের আলোকেই আত্মার সঙ্গে বিশ্বাত্মার পরমাত্মার অবাধ যোগ উপলব্ধি করে অমৃতত্ব প্রাপ্ত জগ"[২৮]

রবীন্দ্রনাথ দুঃখকে 'খাঁটি রতন' বলে উপলব্ধি করেছেন। সাধারণ মানুষ দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে চায় আর কবি দুঃখকেই মহত্ত্বের কারণ বলে অনুভব করেছেন। ৫৪ নং চিঠিতে কাদম্বিনী দেবীকে জীবনে দুঃখ-সুখের ভার কখন বেড়ে ওঠে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে লিখেছেন, -

> "ব্যথা এড়াব এমন সাধ্য আমাদের নেই কিন্তু তাকে সত্য রূপে গ্রহণ করব এটা আমাদের সাধনার অঙ্গ। যিনি চিরন্তন তাঁকে যদি দৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে মনের মধ্যে রাখতে পারি তাহলে যা চঞ্চল সে আমাদের আর আঘাত করতে পারে না। আমরা নিজেকে যখনি বড় করে দেখি তখনি নিজের ভার অত্যন্ত বেড়ে

ওঠে - তখনি দুঃখ-সুখের ঢেউ জীবনকে বড় বেশি তোলপাড় করে তোলে। ... যে দুঃখে আমরা মরি সে আমাদের নিজের হাতের মার। তার মানে এ নয় যে সেই দুঃখের ঘটনা আমাদের নিজের হাতের সৃষ্টি, তার মানে এই যে সেই ঘটনাকে আঘাতস্বরূপে নেওয়া আমাদের নিজেরই কাজ।”[২৯]

পরিশেষে বলা যায় যে, কাদম্বিনী দেবীর সঙ্গে কবির যে শুধু দুঃখ শোকের থেকে নিষ্কৃতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এমন নয় তাঁর সঙ্গে দেশ-কালের কথা, ধর্ম বিষয়ে, ঈশ্বর বিষয়ে, ভারতবর্ষ স্বাধীনতার কথা, ইংরেজদের অত্যাচারের কথা, মেয়েদের শিক্ষাসম্বন্ধে, শান্তিনিকেতন নিয়ে, ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা রয়েছে। এছাড়াও শরীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সংবাদ ও কবির গতিবিধির সংবাদ নিয়ে চিঠি আছে। চিঠিপত্রের ৭ নং খণ্ডে কাদম্বিনী দত্তকে লেখা ৯৫টি চিঠি আছে। ৯৫ নং চিঠি তিনি লিখেছেন ১০ মে ১৯৩১। এর পরের চিঠিটি লেখা নির্ঝরিণী সরকারকে। নির্ঝরিণীকে লেখা ২৪টি চিঠি আছে। ১ নং চিঠিতে দেশের দুর্গতির বিষয়, এবং ৩, ৫, ৮, ১৫, ১৬ নং চিঠিগুলিতে জগদ্ব্যাপারের সমস্ত বিঘ্ন, বিপত্তি ও দুর্বিষহ দুঃখ-তাপের আড়ালে যে ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা আছে – এ বিষয়ে আলোকপাত করা আছে।

Reference:

১. স্বামী, গম্ভীরনন্দ, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, উপনিষদ গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা তৃতীয় সং, ডিসেম্বর ২০১৭
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনা্থ, দুঃখ্, রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র, কামিনী প্রকাশালয়, কল-০৯, জানুয়ারি ২০১৫
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (সপ্তম খন্ড), পত্র – ২, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৬৭
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্রাবলি, পত্র - ১২৮, রবীন্দ্র রচনাবলী (একাদশ খন্ড), জন্মশতবার্ষিক সং ১৩৬৮
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (সপ্তম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৬৭, পত্র ১, পৃ. ১৫৩
৬. কাব্যতীর্থ, শ্রী প্রসন্নকুমার (সম্পাঃ), শ্রীমদ্ভগবদগীতা, রাজেন্দ্র লাইব্রেরী, তারিখহীন, পৃ. ১৫৩
৭. ঐ, পৃ. ৪২৩
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (সপ্তম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৬৭, পত্র - ৪, পৃ. ৯
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (দশম খন্ড), পত্র-১০, বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪০২, পৃ. ১১
১০. সিংহ, কুনাল (সংকলন ও গ্রন্থনা), রবীন্দ্রনাথের চিঠি পারুল দেবীকে, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ২০১৩, পৃ. ৩৫
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (সপ্তম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৬৭, পত্র - ১২, পৃ. ২৪
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (সপ্তম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৬৭, পত্র - ৩, পৃ. ৬
১৩. স্বামী, গম্ভীরনন্দ, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, উপনিষদ গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা তৃতীয় সং, ডিসেম্বর ২০১৭, ঈশোপনিষদ, পৃ. ৩
১৪. স্বামী, গম্ভীরনন্দ, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্, উপনিষদ গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা তৃতীয় সং, ডিসেম্বর ২০১৭, কেনোপনিষদ্, পৃ. ২০
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (সপ্তম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৬৭, পত্র - ৩, পৃ. ৬-৭
১৬. ঐ, পত্র - ২, পৃ. ৪
১৭. ঐ, পত্র - ১, পৃ. ২
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতালি - ১৮ নং, রবীন্দ্ররচনাবলী (ষষ্ঠ খন্ড), বৈশাখ ১৩৯৫, বিশ্বভারতী, কল - ১৭, পৃ. ১৮১
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (চতুর্থ খন্ড), পত্র - ৫৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ, ১৩৫০, পৃ. ১২৮
২০. ঐ, পত্র - ৩৪, পৃ. ৯০
২১. চক্রবর্তী, শ্রী অনিন্দ্যদ্যুতি (প্রকাশক, সম্পাঃ), প্রসঙ্গ সত্যানুসরণ, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ১ম সং, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ৭১
২২. ঐ, পৃ. ২১

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 517 - 526
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (চতুর্থ খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৌষ, ১৩৫০, পত্র - ৬৬, পৃ. ১৫২

২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ক্ষণিকা, বোঝাপড়া, রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খন্ড), বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৩৯৪, পৃ. ১৮৩

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (সপ্তম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৬৭, পত্র - ২০, পৃ. ৪১

২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (সপ্তম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৬৭, পত্র - ৩৮, পৃ. ৭১

২৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র (সপ্তম খন্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৬৭, পত্র - ৩৬ পৃ. ৬৭

২৮. ঐ, পত্র - ৪২, পৃ. ৭৭

২৯. ঐ, পত্র - ৫৪, পৃ. ৮৮

Bibliography:

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, চতুর্থ খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ৩, প্রকাশ- পৌষ, ১৩৫০

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, সপ্তম খন্ড, বিশ্বভারতী, গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা, ১৩৪৯

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, দশম খন্ড, বিশ্বভারতী, কল-১৭, ২৫ বৈশাখ, ১৩৭৪

গম্ভীরানন্দ, স্বামী (সম্পাঃ), উপনিষদ গ্রন্থাবলী, খন্ড - ১,২,৩, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ডিসেম্বর, ২০১৭

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, (চতুর্থ খন্ড) বিশ্বভারতী, ভাদ্র, ১৩৯৪

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র প্রবন্ধ সমগ্র, কামিনী প্রকাশালয়, জানুয়ারি ২০১৫

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, (সপ্তম খন্ড), বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৯৫

সিং, কুনাল, (সংকলন ও গ্রন্থনা), রবীন্দ্রনাথের চিঠি পারুল দেবীকে, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ, চৈত্র ১৪১৯

চক্রবর্তী, শ্রী অনিন্দ্যদ্যুতি, (সম্পাদক ও প্রকাশক), প্রসঙ্গ : সত্যানুসরণ, সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস, ১ম সং, ডিসেম্বর ২০০৯, পুনর্মুদ্রণ - ডিসেম্বর ২০১০

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্রাবলী, রবীন্দ্র রচনাবলী (একাদশ খন্ড), জন্ম শতবার্ষিকী সং, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮